কো ।পে ।ন ।হে ।গে ।ন

মারমেইড-এর দেশ

ডেমনমার্কে প্রথম এসেছিলাম ১৯৮১ সালে সরকারীভাবে সাংস্কৃতিক দলের সাথে। ২০ বছর পরও কোপেনহেগেন শহরটি আগের মতই সুন্দর রয়েছে

লিখেছেন **তামান্না রহমান**

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস যোগে ঢাকা-সিঙ্গাপুর-ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে সাস (স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইনস)-এর মাধ্যমে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ পৌঁছলাম ৫ আগস্ট রাত প্রায় এগারোটায়। এয়ার-পোর্টে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন বাংলাদেশের দুই প্রবাসী কৃতী সন্তান প্যারিসে বসবাসরত মূকাভিনেতা পার্থ প্রতিম মজুমদার এবং কোপেনহেগেনে বসবাসরত শিল্পী কাজল। সঙ্গে আরো দু'জন বাঙালি ব্যবসায়ী। গাড়ি করে কাজল ভাইয়ের বাসায় পৌঁছালাম রাত প্রায় ১২টায়। পরিচয় হলো কাজল ভাইয়ের ডেনিস স্ত্রী লিসের সঙ্গে, যিনি অনায়াসেই বাংলা ভাষা বুঝতে ও বলতে পারেন। ১৯৭২ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশে যাতায়াত করছেন–বাংলাদেশের ওপর তার বিভিন্ন গবেষণা কাজের জন্য। আলাপচারিতায় বুঝতে পারলাম বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি আমাদের থেকেও অনেক বেশি জানেন। ডেনমার্কে অবস্থানের ১১টি দিন এই দম্পতির বাড়িতেই ছিলাম।

সেভ্ভবোর্গ সাংস্কৃদিক উৎসব-২০০১: পরদিন ৬ আগস্ট সকাল ১১টায় যাত্রা শুরু হলো সেভ্ভবোর্গ শহরের উদ্দেশে, সেখানে একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশগ্রহণ করতে। পার্থদা, কাজল ভাই ও আমি প্রথমে ট্রেনে ও পরে বাসে এই শহরে পৌঁছলাম। সেভ্ভবোর্গ ডেনমার্কের একটি সুন্দরতম শহর। এই শহরের একটি একদিনের বাৎসরিক মেলা গত ৯০ বছর ধরে আয়োজিত হয়ে আসছে। সেই মেলাকে কেন্দ্র করে গত ৯ বছর ধরে 'সেভ্ভবোর্গ সাংস্কৃতিক সপ্তাহ' নাম দিয়ে দশ দিনের একটি গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করে থাকে সেভ্ভবোর্গ শহরের সাংস্কৃতিক বিভাগ। খুব ভালো লাগলো শুনে যে স্বয়ং শহরের মেয়র এই সাংস্কৃতিক সপ্তাহের পৃষ্ঠপোষক এবং তার উৎসাহে ক্রমেই এটি একটি আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ডেনমার্কের কয়েকজন প্রথম সারির সঙ্গীত শিল্পীসহ বহু পরিচিত শিল্পী কুশলীদের নিয়ে এবং কিছু বিদেশী স্বনামধন্য শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের সমারোহ ঘটে ১০ দিন ধরে। এ বছর বাংলাদেশসহ আমেরিকা, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, লিথুয়ানিয়া ও হল্যান্ড-এর বিভিন্ন শিল্পীদের আগমন ঘটেছিল সঙ্গীত, ক্ল্যাসিক সঙ্গীত, অপেরা, জ্যাজ, রক, ব্যালেট, মডার্ন ডান্স ও ক্ল্যাসিকাল ডান্স এবং মূকাভিনয়সহ বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার জন্য। বাংলাদেশ থেকে মূকাভিনয় ও নৃত্যের দ্বৈত পারফরমেন্সে অংশ নিই যথাক্রমে পার্থ প্রতিম মজুমদার ও আমি। প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী এ অনুষ্ঠানের দর্শক ছিল সবাই ডেনিশ। আমাদের বিভিন্ন পরিবেশনার মধ্যে পার্থদা'র 'পাখী ও বালক' এবং 'বাস প্যাসেঞ্জার' এবং আমার 'মণিপুরী নৃত্য' ও 'মৃদঙ্গ বাদন' বিশেষভাবে দর্শকের প্রশংসা পায়। সবশেষে মূকাভিনয় ও নৃত্যের যৌথ পরিবেশনা 'জেলের জীবন' দর্শকরা মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে উপভোগ করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ থেকে এই সাংস্কৃতিক উৎসবে কোনো পারফর্মিং শিল্পীর অংশগ্রহণ এই প্রথম। এর আগে শিল্পী কাজলও শহরে ট্রাফিক আর্ট ও অন্যান্য স্কাল্পচার কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশেষভাবে পরিচিত করেছেন। ৭ তারিখে ১ দিনের বিরতি। সেই সুযোগে ঘুরে এলাম পাশের দেশ সুইডেনের ছোট শহর 'মালমো'। কিছুদিন আগেও ফেরি পারাপারের মাধ্যমে যেতে সময় লাগতো প্রায় ১ ঘন্টা। এখন সরাসরি সেতুর মাধ্যমে মাত্র ২০ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম ছবির মত সাজানো- গোছানো শহরটিতে। সারাদিন ঘুরে বিকেলে কোপেনহেগেনে ফিরে দেখতে গেলাম ডেনমার্কের বিখ্যাত সিম্বল 'মারমেইড'। ধাতুর তৈরি মারমেইডটি সত্যিই অসাধারণ এক শিল্পকর্ম কোপেন হেগেনের সমুদ্রতীরে বসে রয়েছে যুগ যুগ ধরে।

একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় পার্থ প্রতিম ও তামান্না রহমান

আমা'র চিলড্রেন কালচারাল হাউজ-এর কর্মশালা: পরদিন ৮ আগস্ট থেকে শুরু হলো 'আমা'র চিলড্রেন কালচারাল হাউজ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত শিশু-কিশোরদের ৩ দিনব্যাপী মূকাভিনয়, মণিপুরী নৃত্য ও চিত্রাঙ্কনের কর্মশালা, যা পরিচালনায় ছিলাম যথাক্রমে পার্থদা, আমি এবং কাজল ভাই। গত ৬ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি কোপেনহেগেন-এর আমা নামক অঞ্চলে শিশু-কিশোরদের নিয়ে কাজ করে আসছে। গত ৩ বছর ধরে আমা অঞ্চলের সমুদ্র তীরে মুক্তাঙ্গনে গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আয়োজন করছে এই সংগঠন। এ বছর এর Concept ছিল– বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা। নাম দেয়া হয়েছিল 'বিশ্ব ঘুরে আমা'। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর ও বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে এখানকার শিশু-কিশোর ও সাধারণ জনগণকে। ৩ দিনে বিভিন্ন স্কুলের বয়সের শিশু-কিশোরদের দল এই কর্মশালায় অংশ নেয়। একেবারে ভিন্ন সংস্কৃতির বিষয় ' মণিপুরী নাচ'কে জানার ব্যাপারে এদের আগ্রহ দেখে অবাক হলাম। অংশগ্রহণকারীরা খুবই আগ্রহ ভরে মণিপুরী নাচের নানা দিক সম্পর্কে জানতে চাইল, শিখতে চাইল। বাংলাদেশের কথা জিজ্ঞেস করায় দু'একজন ছাড়া সবাই বললো তারা জানে না এদেশের নাম বা কোথায় অবস্থিত। খুব সংক্ষেপে আগামী প্রজন্মের বিশ্ব নাগরিকদের জানালাম বাংলাদেশের কথা, এর গৌরবময় স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। ডেনমার্ক টেলিভিশন থেকে এই কর্মশালার সচিত্র প্রতিবেদন প্রচারিত হলো একদিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। পাশের দেশ সুইডেন থেকেও স্কুলের শিশু-কিশোররা এসেছিল একদিন এই কর্মশালায় অংশ নিতে।

কর্মশালার শেষদিন ১০ আগস্ট 'আমা' সংগঠনটি সমুদ্রের ধারে মুক্তাঙ্গনে একটি 'বাংলাদেশ সন্ধ্যা'র আয়োজন করেছিল। বাঙালি খাবারের পরে উপস্থিত দর্শকের সামনে আমি পর পর দুটি মণিপুরী নৃত্য এবং মৃদঙ্গ বাদন পরিবেশন করি। উপস্থিত দর্শকরা ছিল প্রায় সবাই ডেনিশ।

বাংলা উৎসব– ১: ১১ আগস্ট কোপেনহেগেন প্রবাসী বাঙালিরা আয়োজন করেছিল 'বাংলা উৎসব-১' অনুষ্ঠানের। পার্থদা'র মূকাভিনয় ও আমার নাচ ছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুইডেন থেকে আগত

বর্তমানে সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশের গায়িকা সাবিনা আখতার রুনা। এই প্রথম কোপেনহেগেন শহরে নাচ, গান ও মূকাভিনয় সমন্বয়ে এত বড় একটি অনুষ্ঠান হলো। অনুষ্ঠান শুরু হলো ঠিক মধ্যরাত ১২ টায় আমার একটি দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্যের মাধ্যমে। আমি যখন বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলাম তখন হল ভর্তি দর্শক একসাথে উঠে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। পার্থদা ও আমার অনুষ্ঠানের শেষে গানের অনুষ্ঠান চললো প্রায় ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত। অনুষ্ঠান শেষে আমরা যখন বাসায় ফিরে যাচ্ছি তখন ভোরের রক্তিম আলোয় কোপেনহেগেন রাঙা হয়ে উঠছে। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকরা অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি।

আজ থেকে ২০ বছর আগে আমার জীবনের প্রথম সাংস্কৃতিক সফরে বাংলাদেশ সরকারি সাংস্কৃতিক দলের সাথে গিয়েছিলাম ডেনমার্কে ১৯৮১ সালে। স্মৃতিতে যতটুকু মনে আছে সেই সময়ে শহরটিকে যে রকম ছিমছাম দেখেছিলাম, আজও তেমনই আছে। কোনো ট্রাফিক জ্যাম নেই, লোকের উপচে পড়া ভিড় নেই কোথাও– বাস, ট্রেন, স্টেশন, রাস্তাঘাট সব জায়গাতেই একই রকম। ঝকঝকে পরিষ্কার একটি শহর। প্রতিটি মানুষের চেহারাতেও প্রশান্তির ছাপ। দেখলে মনে হয় এদের বোধ হয় কোনো টেনশন নেই। কারণ সম্ভবত ডেনমার্কের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। মানুষের জীবন এখানে নিরাপদ। আজও থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে ডাইকিং রাজা হেরাল্ড ডেনমার্কের গেড়াপত্তন করেছিলেন। এরপর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৫০ জন রাজা ও দু'জন রানী ডেনমার্ক শাসন করেছেন। বর্তমানে ডেনমার্কের রানী মার্গারেট দ্বিতীয় যিনি তার শৈল্পিক গুণের জন্য খ্যাত ও জনপ্রিয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমান্বয়ে ডেনমার্ক একটি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর অন্যতম ডেনমার্ক আজ পৃথিবীর বুকে একটি অনন্য শান্তিপূর্ণ ও মানবাধিকার সচেতন দেশ হিসেবে পরিচিত।

টো । কি । ও

তিন দিনের বনভোজন

প্রতিদিনই দিনমান কাজ। এর বাইরে সেদিন পাহাড়, সাগর আর আগ্নেয়গিরি সত্যি অন্যরকম আনন্দ

সূর্যোদয়ের দেশ জাপান। অথচ আমরা সূর্যোদয় দেখি না কতদিন। সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ার আগেই আমরা ছড়িয়ে পড়ি কর্মক্ষেত্রে। কখন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে যায় তা দেখার অবকাশ নেই। তাই প্রবাসী বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'উত্তরণের' বনভোজনের সুবাদে চোখ জুড়ালাম সূর্যোদয় দেখে। প্রায় ৩০ জন ছিলাম। গন্তব্য টোকিও থেকে প্রায় দুইশ' মাইল দূর। সিজোকার ইজু অঞ্চলের কাওয়াজুনি পাহাড়ি এলাকা। তিন দিনের বনভোজন। টোকিওতে প্রচন্ড গরম থাকলেও গন্তব্যস্থলে প্রচন্ড শীত। অবশেষে যাত্রা শুরু রাত তিনটায়। হাইওয়েতে পৌঁছা মাত্রই গিটারে ঝংকার তুললেন রতন ভাই। সেই সঙ্গে বেজে উঠলো মন্দিরা, কৃষ্ণকাঠি আর বায়া। শুরু হলো গান। কখনো দেশের গান, কখনো প্রেমের গান, কখনো মরমী আবার কখনো মায়ের গান। প্রবাস জীবনে মায়ের গান অন্তর ছুঁয়ে যায় সবার। গাড়ি থামালেন মান্না ভাই। দশ মিনিট বিরতি। বহুদিন পর একটি অবসর ভোর দেখলাম। হাত-মুখ ধুয়ে আবার শুরু হলো যাত্রা।

সকাল ১১টায় পৌঁছলাম ইজুর কাওয়াজুনি পাহাড়ি এলাকায়। গাড়ি নিয়ে উঠে গেলাম বহুদূর। ঝর্ণা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের কান্না। এমন সময় নামলো মুষলধারে বৃষ্টি। পাহাড় কর্তৃপক্ষ জানালেন, আপাতত বাংলোতে অবস্থানের জন্য। বৃষ্টি থামলেই তাঁবু গাড়তে হবে। আরও শত শত জাপানি তাঁবু তৈরির অপেক্ষায়। বৃষ্টি থামলো। কর্তৃপক্ষ পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাঁবু আর কম্বল। মুহূর্তেই বিশাল পাহাড়ের বুক ভরে গেলো তাঁবু আর তাঁবুতে। ছয় গ্রুপে বিভক্ত রান্না করার দায়িত্বে নিয়োজিতরা মেতে উঠলেন রান্নায়। হালাল ফুড থেকে কেনা পদ্মার ইলিশ আর গলদা চিংড়ি কি যে সুস্বাদু। সন্ধ্যায় পোড়া মাংস আর জাপানিজ ছোবা। ইতিমধ্যে ঝর্ণার পানিতে ডুবিয়ে রাখা ড্রিঙ্কস্ আর তরমুজ তুলে আনা হলো। খাবার শেষে গানের আসর। জাপানিরাও নাচতে থাকে বাংলাদেশের উদাস করা ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, পল্লীগীতি আর লোকগীতির তালে তালে। দ্বিতীয় দিন আমরা যাই প্রশান্ত মহাসাগরে। দুপুর গড়ালে ফিরে আসি তাঁবুতে। পালাক্রমে চলে রান্না। মাছ পুড়ে খাওয়া, মাংস পুড়ে খাওয়া চলে প্রথম পর্বে। তারপর সঙ্গীত সন্ধ্যা। রাত ১১ টায় সঙ্গীতের সমাপ্তি টেনে শুরু হয় জাপানের ঐতিহ্যবাহী আতসবাজি (হানাবি)। রাত ১টা পর্যন্ত চলে এ পর্ব। তারপর ভুরিভোজন। পরদিন সকালে নাস্তা খেয়ে যাত্রা করি ঝর্ণা দেখার উদ্দেশ্যে। সুউচ্চ পাহাড়ের এই ঝর্ণার হিমশীতল পানিতে গোসল করি ক'জন। শরীর যেন ফ্রিজ হয়ে যায়। বেলা গড়িয়ে গেলো। শেষ হলো না দেখার পালা। পথে শুধু পাহাড়ের নিচে থেকে আগ্নেয়গিরির ভলকানে গড়ে ওঠা গরম পানিতে ভিজিয়ে নিলাম শরীর। ফিরতি যাত্রা শুরু হলো টোকিওর দিকে। ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হলাম বিষণ্নতায়। আবার কাজ, দিনমান খাটো, দৌড়াও।

পাহাড়ের বুক চিড়ে বয়ে যাওয়া নদীর তীরে বাঙালি তরুণীরা

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে বাঙালিদের বিচরণ

Moni, Amano-so-201, 1-27-15
Asagaya-kita, Suginami-Ku,
Tokyo-166-0001, Japan

কু য়ে ত

বিচিত্র জীবন

কুয়েতের জীবনযাত্রা বিচিত্র। এখানে মেয়েরা বোরখাও পরে আবার মিনি স্কার্ট, জিনস্‌ও পরে

ছোট দেশ কুয়েত। বলা যায় সমস্ত দেশটাই তেলের ওপর ভাসমান। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ কুয়েত ইরাকি আগ্রাসনের পরেও তার অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা রাখতে পেরেছে। কুয়েতের দিনার, যা এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে দামী মুদ্রা। এখানকার জীবনযাত্রার মানও উন্নত। শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না কুয়েতিদের। ঐ দুই খাতে সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করে। এখানে ৬৩৮ জনের জন্য একজন ডাক্তার।

অন্যান্য আরবীয়দের মত কুয়েতিরাও বিলাসিতায় মগ্ন। অলসও বটে। শুনেছি ইরাকি সৈন্য যেদিন কুয়েতের অলিগলিতে, কুয়েতিরা অনেকেই তা জানতো না। এমনকি অনেক আর্মি পরের দিন ডিউটিতে যাওয়ার সময় দেখে তাদের দেশ ইরাকিদের দখলে। কুয়েতে কোনো আর্মি ক্যান্টনমেন্ট নেই। বর্তমানে কুয়েত আধুনিক অস্ত্র সাজে সজ্জিত হয়েছে একমাত্র ইরাককে ঠেকানোর জন্য। অথচ এই ইরাকই ছিল কুয়েতের সবচেয়ে মিত্র দেশ।

দুই ঋতুর দেশ কুয়েত। শীতে প্রচন্ড শীত না পড়লেও গরমের প্রচন্ডতা এখানে খুবই তীব্র। প্রতি বছর সামারে কুয়েতিরা আমেরিকা, লন্ডন, প্যারিসে সময় কাটাতে চলে যায়। একবার হলেও প্রতি বছরই দেশ ভ্রমণে যাবেই। এবার কুয়েতি মেয়েদের ব্যাপারে আসি। কুয়েতে মেয়েরা বোরখাও পরে, স্কার্টও পরে আবার মিনি স্কার্টও পরে। পশ্চিমা ফ্যাশনে দেখা যায় অনেক মেয়েকেই। ১৮ বছর হলে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে থাকে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া মানে সব লাইসেন্স পাওয়া। তখন থেকেই শুরু হয় বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ডেটিং। গত বছর একটি পত্রিকার জরিপে দেখা গেছে ১ জন কুয়েতি মেয়ের গড়ে ৪ জন বয়ফ্রেন্ড আছে।

কুয়েতের লিবার্টি টাওয়ার

কুয়েতি মেয়েদের গড়ে ২৫ বছরের পূর্বে বিয়ে হয় না বললেই চলে। চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া অনেক কুয়েতি মেয়ে আছে যাদের এখনও বিয়ে হয়নি। আর বিবাহ বিচ্ছেদের হারও এখানে আশঙ্কাজনক। পত্রিকার সূত্র অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের হার ৩৮%। মূল কারণ পরকীয়া। প্রায় ২৮% কুয়েতি মেয়ে ধূমপায়ী। এখানে ফাস্টফুডের ব্যবসা খুবই রমরমা। খাদ্যদ্রব্যের দাম এখানে বেশ কম। কারণ সরকার এই খাতে ভর্তুকি দিয়ে থাকে।

অবশ্য বলে রাখা ভালো, এখানে কুয়েত সম্পর্কে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

আদিব মাহমুদ, কুয়েত

রো ম

পাহাড়ের গুহায় বনভোজন

প্রবাসের ক্লান্তিহীন জীবনেও মানুষ চায় একটু অবসর, একটু বিনোদন। প্রিয়জন পরিচিতজনদের সাথে একটু এক হওয়া...

প্রতি বছরের মত মানিকগঞ্জ সমিতি বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করে ১৫ আগস্ট ২০০১। ৫০,০০০ লিরার ছিল বনভোজনের নির্ধারিত চাঁদা। সকাল ৭টায় স্টেশন Romatermini'র পাশ থেকে সবাই বাসে ওঠার সময় প্রত্যেককে একটি করে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। সকাল ৮টায় Frasass গুহার উদ্দেশে বাস রওয়ানা হয় বিসমিল্লাহ মাজরেহা ওয়া মোরছাহা বলে। দুপুর ১টার মধ্যেই বাস এসে থামে Frasass। পাহাড়ের কাছে তখন লোকে লোকারণ্য। অতঃপর দুপুরের খাওয়া।

পৃথিবীর আশ্চর্য এক পাহাড়ের গুহা যা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই পাহাড় দেখার জন্য টিকেটের ব্যবস্থা জন প্রতি ২০,০০০ লিরা তবে গ্রুপ টিকেট ১৬,০০০ লিরা। আমরা ৮০ জন গ্রুপে টিকেট কেটে নিলাম। টিকেট কাউন্টার থেকে প্রায় আধমাইল দূরে এই পাহাড়।

গেট থেকে প্রবেশ করে ওদের নির্দিষ্ট লোক আছে পথপ্রদর্শক। Alexandra নামক প্রথম গুহায় নিকষ অন্ধকার। টর্চের আলোয় দেখি লেখা আছে ছবি তোলা নিষেধ। ধূমপান নিষেধ। পাহাড়ের কোনো স্থানে হাত দেয়া নিষেধ। এ এক আশ্চর্য বস্তু। পাহাড়ের মাঝে এক ফাঁকা স্থান। কখনো ২১০ মিটার আর ৩৮০ মিটার ফাঁকা। একটি ফাঁকা স্থান অতি সুউচ্চ ৬০০ মিটারের মত। আবার অনেক স্থানে ওপর থেকে পাহাড়ের পানি পড়ে বরফ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১৬২০ সালে FABRIANO LEONE পাহাড়ের ওপর থেকে একটি গর্ত করে নিচে নামার জন্য রশি ফেলে এবং নিচে নেমে এই গুহা আবিষ্কার করা হয়। ১৮২৭ সালে এ গুহা মানুষ দেখার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে থাকে। ১৯৭১ সাল থেকে এই গুহা পর্যটকদের দেখার জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

বনভোজনে আগত উচ্ছ্বল বাঙালিরা

গুহার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম। এই পাহাড়ের গুহা ঘুরে ঘুরে দেখতে প্রায় ২ থেকে ৩ ঘন্টা সময় লাগে। আল্লাহর অসীম সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই, আশ্চর্য হই।

সবার আনন্দে আনন্দে কেটে যায় এই দিনটি। অবশেষে ফেরার পালা।

রেজাউল করিম মৃধা
রোম, ইটালি

টো ি কি ও

একাকীত্বের জীবন...

নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানরা একটি বারের জন্য মায়ের খবরও নেয় না। একাকীত্ব নিয়ে জীবন কাটে...

পোষা প্রাণী পছন্দ করে না এমন জাপানিজ কম পাওয়া যাবে। এখানে পেট শপ, পেট হোটেল এবং পেট হস্পিটাল সর্বত্র দেখা যায়। পোষা প্রাণীদের মধ্যে কুকুরই সবচেয়ে জনপ্রিয়। বয়স্কদের মধ্যে কুকুর প্রীতি একটু বেশিই মনে হয়।

আমার বাড়ির মালিক '৭৫ বছরের বৃদ্ধা নাতি নাতনি ৭ জন, সবাই যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বৃদ্ধাকে দেখার মত কেউ নেই। যদিও ৭৫ বৎসর বয়স জাপানিজদের কোনো ব্যাপারই না। বৃদ্ধা একটি কুকুর ও একটি বিড়াল পোষে। আবার সন্তানের মত আদর যত্ন করে।

দুঃখজনকভাবে বৃদ্ধার কুকুরটির নাম আর আমার প্রাণপ্রিয় সন্তানটির নাম একই। উভয়ের নাম আইকো (AIKO)। বলে রাখা ভালো জাপানিজ ভাষা A (আই) যার অর্থ হল Love এবং এখানে -KO (কো) অর্থ সন্তান বা বাচ্চা বা এই জাতীয় অর্থে।

আমি না হয় আমার বাচ্চার নাম আইকো রেখেছি। আমাদের উভয়ের ভালোবাসার ফল হিসেবে কিন্তু বৃদ্ধ রেখেছে কোন্ দুঃখে। এক দিন কাজ থেকে ফিরে দেখি বৃদ্ধা মন মরা হয়ে বসে আছে। জানতে চাইলে খুব দুঃখের সঙ্গে জানালো যে, আইকো আর বাঁচবে না।

ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াতে জানা গেল যে, কুকুরটির অনেক বয়স হয়েছে। বার্ধক্যজনিত কারণ। কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই মানতে চাচ্ছে না যে, আইকো বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত এবং মরে যাওয়ায় সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাতে বুঝালাম যে, মানুষ সব শোকই ভুলে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। এমনকি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, প্রিয়জন, সন্তান মরলেও কয়েক দিন পর স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর এজন্যই মানুষ। কিন্তু তার যুক্তি হলো মানুষ স্বার্থপর বেইমান হয়। কিন্তু পোষা কুকুর কখনও বেইমানি করে না। তার তিন ছেলের কথা বলল। তারই তৈরি তিনটি বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকছে কিন্তু তাকে দেখে না। অথচ কুকুরটি তাকে ছেড়ে একটিবারের জন্য কোথাও যায়নি। তাই মানুষ হলো বন্য পশুর মত হিংস্র। বৃদ্ধাকে কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। মানুষ তো হিংস্র বটেই। নয়তো আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে প্রেমিকার শরীর এসিডে ঝলসে দেওয়া, স্ত্রীকে হত্যা, সমাবেশে বোমা মেরে মানুষ মারা, সামান্য কারণে খুন করা এসব তো কম হিংস্রতার পরিচয় নয়, তাই নয় কি?

Rahman Moni
Sanko Bldg 201, Tabata Shin Machi
2-3-5, Kita-ku.Tokyo

সু ই জা র ল্যা ন্ড

বাংলাদেশ প্রেমিক Martin

সুইস নাগরিক Martin বাংলাদেশ ভালোবাসে। বাংলাদেশ তার কাছে 'দ্বিতীয় মাতৃভূমি'

প্রকৃতির অকৃপণ হাতে দেয়া সৌন্দর্যের জন্য সুইজারল্যান্ডকে বলা হয় ইউরোপের ক্রীড়াভূমি। প্রতিটি সুইস নাগরিক তার বাৎসরিক কাজের ছুটি কাটায় দেশের বাইরে। বছরে অন্তত একবার ছুটি কাটাতে কোনো ব্যক্তি দেশের বাইরে যেতে না পারলে সেই ব্যক্তি নিজেকে খুবই অসুখী ভাবে।

আমার কাজের বন্ধু Martin সে স্কুল জীবনেই মাতা-পিতার সঙ্গে ইউরোপের অনেক দেশ ঘুরেছে। লেখাপড়া শেষ করে বেশ কয়েক বছর আমেরিকা ও কানাডায় কাটিয়েছে। ভ্রমণবিলাসী Martin বছরে ৮ মাস সুইডেনে চাকরি করে যে অর্থ সঞ্চয় করে। বছরের বাকি চার মাস এশিয়া ও আফ্রিকায় কাটিয়ে আবার দেশে চলে আসে। Martin বাংলাদেশে প্রথম আসে ১৯৯২ সালে। সেবার সে বরিশাল, খুলনাসহ দক্ষিণাঞ্চলে চার মাস কাটায়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে এতটাই মুগ্ধ করে যে সে ১৯৯৪ সালে আবার বাংলাদেশে আসে। সেবার Martin চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ২ মাস কাটায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত থাকায় তার হাতের বাকি দুই মাসের ছুটি কাটাতে ভারতের পুনায় যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেখানে প্রতারকের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে শেষে দূতাবাসের সহযোগিতায় দেশে ফিরে। আমার সঙ্গে আলাপে Martin জানায়, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন শান্ত। তাই সে এ বছরই বাংলাদেশে তার ৪ মাস ছুটি কাটাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেমিক মার্টিন

এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ সে ভ্রমণ করেছে। তার মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র যে দেশে এবার তৃতীয়বারের মত যাচ্ছে। আরো বলে, বাংলাদেশকে আমি আমার Second home land ভাবি। তবে প্রতিবারই আসা-যাওয়ার পথে ঢাকা বিমান বন্দরের কাস্টমস কর্মকর্তাদের হাতে তাকে নাজেহাল হতে হয়েছে। আমার এই বন্ধুকে বলিনি আমাদের দেশে কর্মকর্তাদের কাজই নিরীহদের হয়রানি করা। আমি Martinকে বলিনি তোমার Second home land এবার দুর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আরও বলিনি এ দেশের রাজনৈতিক সহিংসতাসহ প্রতিদিন গড়ে আটজন মানুষ অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। এই সংখ্যাটির একটি কপি কেউ পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

Afiz Uddin
Hofacker st-25, 8032 Zurich
Switzerland

ভি া সে া ন া জা

রাজনৈতিক আশ্রয়

অবৈধভাবে থাকার সুযোগ এখন আর নেই। দিন দিন আইন আরো কঠোর হচ্ছে। এরচেয়ে বরং নিতে পারেন রাজনৈতিক আশ্রয়ের সুযোগ

ইটালি ও ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক চুক্তি জেনেভা কনভেনশন মানব অধিকার আইন অনুযায়ী যে কোনো দেশের নিপীড়িত-নির্যাতিত ব্যক্তি রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে আতিথেয়তা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি সুবিধাদি প্রদান করতে আন্তর্জাতিক আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যে কোনো দেশে প্রবেশের পূর্বে বর্ডারে ইমিগ্রেশন বিভাগের কাছে অথবা অবৈধভাবে প্রবেশ করলেও প্রবেশের আট দিনের মধ্যে যে কোনো শহরে অবস্থান করে সেই শহরের কস্তুরার (থানা) পুলিশ বিভাগের রিফিউজি সেকশনের মাধ্যমে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে হবে। ইটালিতে বর্তমানে অনেক বাংলাদেশী অবৈধভাবে অবস্থান করছে। তাদের অতি শিগগির রাজনৈতিক আশ্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। কেননা আগের চেয়ে আইন এখন অনেক কঠিন ও কড়াকড়ি। বৈধ লোকেরাই রয়েছে নানান ঝামেলায়। আর অবৈধদের কথা তো চিন্তাও করা যায় না।

অবৈধ যারা আছে তাদের উচিত রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করা। যদিও এই রাজনৈতিক আশ্রয়ের সুযোগ আগেও ছিল। কিন্তু তখন অবৈধভাবে কাজ করা তেমন সমস্যা ছিল না। অবৈধভাবে থাকাও যেত কিন্তু নতুন আইনে সেটা রহিত করা হয়েছে।

রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী সরকারিভাবে থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও পরে কাজের সুযোগ পাবে। কিন্তু অবৈধভাবে কোনো কিছু পাবে না। আবেদনকারী প্রথম তিন মাস থাকার অনুমতি পাবে। আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৩ মাস করে রিনিউ করা হবে। আশ্রয় কেন্দ্রে থাকতে দেওয়া হবে। প্রাথমিক সাহায্য হিসেবে প্রতিদিন ৩৪ লিরা করে ৪৫ দিন সাহায্য পাবে। ৪৫ দিন পর কাজ করার সুযোগ পাবে। তবে তাকে শ্রমিক বিনিয়োগ কেন্দ্রের বেকার শ্রমিক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন সংগ্রহ করতে হবে। ভবিষ্যতে সাধারণ ক্ষমায় কাজের বিনিময়ে ইমিগ্রেশনের সুযোগও পাবে। তবে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী নিজ দূতাবাসে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারবে না। রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেশ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে যেভাবে কড়াকড়ি চলছে তাতে ভবিষ্যতে ইমিগ্রেশন স্পন্সর ইত্যাদি আরো কঠিন হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে স্পন্সর জমা দিতে এখনও বেশির ভাগ লোক পায়নি। কবে পাবে তার ঠিক নেই। দিন দিন ইউরোপে আসা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। যারা আসতে আগ্রহী তাদের সবদিক দেখেশুনে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আগের সুযোগ-সুবিধা এখন আর নেই। তারপর গরিব দেশের লোকদের রিস্ক তো নিতেই হবে।

মানিক চৌধুরী, ইটালি

মা া ল া য়ে া শি া য়া

লজ্জা

অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশ। আমাদের কি উচিত এভাবে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা?

মালয়েশিয়ায় বাঙালিদের অপতৎপরতার কথা অনেকেরই জানা আছে। প্রেম, বিয়ে, সন্তান জন্ম দিয়ে পালানো, চুরি, ছিনতাই– আসলে প্রবাসীদের ওপর অত্যাচার, দুর্ভাগ্যের জন্য আমরাই দায়ী।

ক'বছর আগে মালয়েশিয়ার জহুর বারু এলাকায় বাঙালির দ্বারা এক খুনের ঘটনা সমগ্র মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের প্রথম সূচনা হয়। তেমনি ঐ জহুর বারুতেই আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত হয় বাঙালির হাতে এক পরিবারের ৬জন সদস্যকে মাঝরাতে হত্যার মাধ্যমে।

বাঙালি খুনি রেহাই পায়নি আইনের হাত থেকে। শুরু হয় আইন-আদালত। আর আমরা প্রবাসীদের অনুরোধ করে বলেছিলাম আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন আমাদের মাতৃভূমি ও আমাদের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চলা উচিত। এমন কর্মকান্ডে জড়ানো উচিত নয় যেটা সমগ্র জাতি এবং দেশের মর্যাদায় দারুণভাবে আঘাত হানতে পারে।

আমাদের ভাবা উচিত আমরা একটি স্বাধীন দেশের মানুষ, আমাদের সুনাম আছে, আছে গর্ব করার মত প্রাচীনতম সভ্যতা। বহু রক্তের বিনিময়ে আমাদের এ দেশ। আমাদের কি উচিত এভাবে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা?

মোঃ দেলোয়ার
মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ায় গ্রেফতারকৃত দুই প্রবাসী বাঙালি